সহজ ফিকহ শিক্ষা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ফিকহী উত্তরাধিকারের মর্যাদা ও এর বৈশিষ্ট্য:

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বেশ কিছু অনন্য বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১- ইসলামী ফিকহর মূল হলো আল্লাহ প্রদত্ত অহী:

হ্যাঁ, ইসলামী ফিকহ অন্যান্য শাস্ত্র থেকে আলাদা। কেননা এর মূল উৎস হলো আল্লাহর অহী, যা কুরআন ও সুন্নার মাধ্যমে এসেছে। অতএব, প্রত্যেক মুজতাহিদই আবদ্ধ ও আদিষ্ট হয়েছে এ দু’টি মূল উৎস থেকে শরী‘আতের বিধান উদ্ভাবন করতে। অথবা এ দু’টি থেকে সরাসরি উদ্ভাবিত শাখা উৎসসমূহ থেকে, অথবা শরী‘আতের রূহ মৌলিক দাবীর চাহিদা থেকে, অথবা শরী‘আতের সাধারণ মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য থেকে, অথবা শরী‘আতের মৌলিক নীতিমালা থেকে। এভাবেই এ শাস্ত্রটি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে, এর নিয়মনীতি ও মূলনীতি পূর্ণ করতে উৎপত্তিগত পূর্ণতা, ভিত্তিগত মজবুতি, দৃঢ় খুঁটিগত অবস্থানসহ অহী নাযিলের সময়কাল থেকেই স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে আছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি‘আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

অতএব, এ ঘোষণার পরে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে শরী‘আতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার ও প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না।

২- ইসলামী ফিকহ জীবনের সর্বক্ষেত্র পরিব্যপ্ত:

ইসলামী ফিকহ মানব জীবনের তিনটি ক্ষেত্র শামিল করে। তা হলো: তার রবের সাথে তার সম্পর্ক, তার নিজের সাথে তার সম্পর্ক এবং সমাজের সাথে তার সম্পর্ক। কেননা ইসলামী ফিকহ দুনিয়া ও আখিরাতের, দীন ও রাষ্ট্রের, সকল মানব জাতির এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। অতএব, এর সমস্ত বিধান আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন ইত্যাদি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখে; যাতে মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করতে পারে, স্বীয় কর্তব্যের অনুভূতিকে সজাগ করতে পারে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর তত্ত্বাবধান অনুধাবন করতে পারে। সন্তুষ্ট ও প্রশান্তচিত্তে অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে পারে। ঈমান, সৌভাগ্য, স্থিতিশীলতা, ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবন সুগঠিত করতে পারে এবং সমস্ত পৃথিবীকে সুখী ও সম্মৃদ্ধি করতে পারে।

এ সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলামের ব্যবহারিক বিধি-বিধান (ফিকহ) অর্থাৎ মানুষের কথা, কাজ, চুক্তি ও লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানকে প্রধানত দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

প্রথমত: ইবাদত সম্পর্কিত বিধি-বিধান: যেমন, ত্বহারাত, সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত, মানত ইত্যাদি যা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সুসংগঠিত করে।

দ্বিতীয়ত: লেনদেন সম্পর্কিত বিধি-বিধান: যেমন, বেচাকেনা, লেনদেন, শাস্তি, অপরাধ, জমানত ইত্যাদি যা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুবিন্যাস করে, চাই তারা ব্যক্তি হোক বা সমষ্টি। এ ধরণের বিধি-বিধান নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে বিভক্ত:

ক- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন: সেগুলো হচ্ছে পারিবারিক আইন। মানুষের পারিবারিক জীবনের শুরু থেকে শেষ বিদায় পর্যন্ত যা কিছু দরকার যেমন, বিয়ে-শাদী, তালাক, বংশ, ভরণ-পোষণ ও মিরাস ইত্যাদি। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো দাম্পত্য জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক গঠন।

খ- নাগরিক আইন: এ আইন মানুষের একজনের সাথে অন্যের লেনদেন ও আদান-প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, বেচাকেনা, ধার, বন্ধক, জামিন, অংশীদারিত্ব, ঋণ প্রদান ও গ্রহণ ও অঙ্গিকার পূরণ ইত্যাদি। এ আইনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও অধিকার সংরক্ষণ।

গ- ফৌজদারি আইন: মানুষের অপরাধ এবং এর সাজা সম্পর্কিত আইন। এ আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও অধিকার সংরক্ষণ করা। এ ছাড়া অপরাধীকে অপরাধের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন এবং এর দ্বারা সমস্ত মানুষকে অপরাধের শাস্তির পরিণতির ভীতি দেখানো, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এ আইনের অন্যতম লক্ষ্য।

ঘ- নাগরিকের কাজ-কর্ম ও অপরাধ উপস্থাপন সম্পর্কিত আইন (বিচার): এটি বিচার ও আইন, বাদী বা বিবাদীর দাবী, সাক্ষ্য প্রমাণ, শপথ ও আলামত ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রমাণ প্রভৃতি সম্পর্কিত আইন-কানূন। এ আইনে লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ- সাংবিধানিক আইন: রাষ্ট্র পরিচালনা ও এর নিয়মনীতি সম্পর্কিত আইন। এ আইনের লক্ষ্য হচ্ছে শাসকের সাথে জনগণের সম্পর্ক, জনগণের অধিকার ও কর্তব্য এবং শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

চ- আন্তর্জাতিক আইন: স্থিতিশীল ও যুদ্ধাবস্থায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের কী ধরণের সম্পর্ক হবে, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক, জিহাদ, সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি সম্পর্ক সুবিন্যাস করা। এ আইনের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্মানবোধ নির্ধারণ করা।

ছ- অর্থনীতি ও সম্পদ সম্পর্কিত আইন: এ আইনে মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেন ও অধিকার, রাষ্ট্রের অধিকার ও এর সম্পদ নিয়ে করণীয়, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও এর বণ্টন নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো ধনী, গরীব, রাষ্ট্র ও এর জনগণের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুসংগঠিত করা।

এ আইন রাষ্ট্রের সাধারণ ও বিশেষ সব ধরণের সম্পদ শামিল করে। যেমন, গনীমত, আনফাল, পণ্যকর, (যেমন কাস্টমস), খাজনা (ভূমির ট্যাক্স), কঠিন ও তরল খনিজ, প্রাকৃতিক সম্পদ। এছাড়াও এতে রয়েছে সমাজের সমষ্টিগত সম্পদ। যেমন, যাকাত, সাদাকাহ, মান্নত, ঋণ। আরও শামিল করে পারিবারিক সম্পদ। যেমন, পরিবারের ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকারী সম্পদ, অসিয়ত। আরও একত্রিত করে ব্যক্তিগত সম্পদ। যেমন, ব্যবসায়ের লাভ, ভাড়া, অংশীদারী কারবার, সব ধরণের প্রকল্প ও উৎপাদনের ব্যয়সমূহ। আরও আছে অর্থনৈতিক দণ্ড (জরিমানার অর্থ), যেমন, কাফফারা, দিয়াত ও ফিদিয়া ইত্যাদি।

জ- শিষ্টাচার ও রীতিনীতি: এ আইন মানুষের খামখেয়ালিপনা সীমিত করে, ভালো গুণাবলী বিকশিত করে, মানুষের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা ও দয়ার্দ্রতা ইত্যাদিকে উৎসাহিত করে।

ফিকহ শাস্ত্র এতো প্রশস্ত ও বিস্তৃত হওয়ার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩- ইসলামী ফিকহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: এতে বৈধ অবৈধ নির্ধারণের বিষয়টি দীনী গুণে গুণান্বিত:

মানব রচিত অন্যান্য আইনের থেকে ইসলামী ফিকহের পার্থক্য হলো, এতে সব ধরণের কাজ-কর্ম, নাগরিকের লেনদেন ইত্যাদি সকল কাজেই হালাল হারামের নীতি বিদ্যমান যা লেনদেনকে দু'টি গুণে গুণান্বিত করে। সে দু'টি হচ্ছে:

প্রথমত: বাহ্যিক কাজ ও লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী হুকুম প্রদান, যা অপ্রকাশ্য বা গোপনীয় কিছুর সাথে সম্পর্কিত হয় না। আর তা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থার বিধান। কেননা বিচারক ব্যক্তির বাহ্যিক ও স্পষ্ট রূপ দেখেই ফয়সালা করে থাকেন।

আর এ প্রকারের হুকুম প্রদান করার মাধ্যমে বাস্তবে যা বাতিল সেটাকে হক করা হয় না, অনুরূপ বাস্তবে যা হক তাকে বাতিল করা হয় না, বাস্তবে যা হালাল তাকে হারাম করা হয় না, আবার বাস্তবে যা হারাম তাকে হালাল করাও হয় না। (অর্থাৎ বিচারের কারণেই যে হক বাতিল হবে বা বাতিল হক হয়ে যাবে, হালাল হারাম হয়ে যাবে বা হারাম কাজটি হালাল হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়) তবে বিচারের ফয়সালা মান্য করা অত্যাবশ্যকীয়, যা ফতওয়ার বিধানের বিপরীত। কেননা ফতওয়ার হুকুম মান্য করা অত্যাবশ্যকীয় নয়।

দ্বিতীয়ত: জিনিসের প্রকৃত ও বাস্তবরূপের ওপর ভিত্তি করে আখিরাতের হুকুম দেওয়া, যদিও বিষয়টি অন্যের কাছে অস্পষ্ট। এটা হচ্ছে বান্দা ও আল্লাহর মাঝের ফয়সালা। এটি মহা-বিচারকের (আল্লাহর) হুকুম। এটি সাধারণত মুফতি তার ফতওয়ায় নির্ধারণ করেন।

৪- ইসলামী ফিকহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: এটি আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত:

মানব রচিত অন্যান্য আইনের সাথে ইসলামী ফিকহের পার্থক্য হলো: এতে আখলাকী নিয়মরীতির প্রভাব বিদ্যমান। মানব রচিত আইনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখা ও সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ কাজ করতে যদিও দীনি বা আখলাকী কোনো মূলনীতির সাথে সংঘর্ষ বাধে তবুও তাতে কোনো পরওয়া করা হয় না।

অন্যদিকে ইসলামী ফিকহ সর্বদা সৎ গুণাবলী, সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠিত আখলাকী নিয়ম কানুনের প্রতি খেয়াল রাখে। এ কারণে মানবাত্মাকে পবিত্রকরণ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে ইবাদাত নীতির প্রণয়ন করা হয়েছে। রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছে যাতে মানুষের মাঝে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ও দয়া বিদ্যমান থাকে, সম্পদের মালিকের থেকে অভাবীবের সম্পদ হিফাযত করা যায়। লেনদেনে ধোকা ও নকল করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অজ্ঞতা ও অসন্তুষ্টি ইত্যাদি এ জাতীয় দোষ-ত্রুটির কারণে লেনদেনকে বাতিল করা হয়েছে। সকলের মাঝে ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সম্প্রসারণ, মানুষের মাঝে ঝগড়া-ঝাটি বারণ, নোংরা থেকে মুক্ত থাকা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ইসলামী ফিকহ সর্বদা আদেশ দেয় ও উৎসাহিত করে।

লেনদেনের সাথে যখন উত্তম চরিত্র একত্র হয় তখন ব্যক্তি ও সমাজের সুখ-সৌভাগ্য বাস্তবায়িত হয় এবং এতে

চিরস্থায়ী জান্নাতের পথ সুগম হয়। এভাবে ইসলামী ফিকহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের উত্তম মানুষ তৈরি করা ও উভয় জগতে সুখী করা। এ কারণেই ইসলামী ফিকহ সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য ও সবসময় বাস্তবায়নযোগ্য। ফিকহের কাওয়ায়েদ কুল্লিয়া (সর্বজনীন নীতিমালাসমূহ) কখনও পরিবর্তন হয় না। যেমন, বেচাকেনায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সন্তুষ্ট থাকা, ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ ও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা ইত্যাদি গুণাবলী কখনও পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে কিয়াস, মাসালিহ মুরসালা (জনস্বার্থ), রীতি ও প্রথার ওপর ভিত্তি করে যে ফিকহ গঠিত তা যুগের চাহিদা, মানব কল্যাণের সুবিধা মোতাবেক, বিভিন্ন স্থান ও কালের পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজন গ্রহণ করে, যতক্ষণ ফিকহের হুকুমটি শরী‘আতের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের খেয়াল রেখে ও এর সঠিক উসূলের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হবে। এসব পরিবর্তন শুধু মু‘আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর এটিই নিম্নোক্ত কায়েদা দ্বারা উদ্দেশ্য:

تتغير الأحكام بتغير الأزمان.

“সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানও পরিবর্তন হয়।”

তাহলে নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, ফিকহের বিধান অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যকীয় ওয়াজিব।

হ্যাঁ, ফিকহের ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা মুজতাহিদের কাছে যেটি তার ইজতিহাদ অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে সে অনুযায়ী আমল করা তার ওপর ওয়াজিব। এটি তার জন্য আল্লাহরই হুকুম। আর মুজতাহিদ ছাড়া অন্যদের জন্য মুজতাহিদের ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা উক্ত বিষয় সম্পর্কে শর‘ঈ বিধান জানতে মুজতাহিদকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٧﴾ [الانبياء: ٧]

“সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭]

আর তাই শরী‘আতের যেসব বিধান অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলো অস্বীকার করা বা কোনো হুকুমকে নির্দয় ও অমানবিক বলে মনে করা, যেমন, অপরাধের শাস্তির বিধান অথবা ইসলামী শরী‘আত সর্বযুগে প্রযোজ্য নয় এ দাবী করা কুফুরী হিসেবে গণ্য হবে এবং সে মুরতাদ হয়ে যাবে। অন্যদিকে যেসব বিধান প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করলে সে গুনাহগার ও যালিম হবে। কেননা মুজতাহিদ সঠিকটি জানতে ও আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করতে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এতে তিনি তার ব্যক্তিগত খামখেয়ালী অথবা ব্যক্তি স্বার্থ বা নামডাক ও সুনাম-সুখ্যাতি থেকে দূরে থেকেছেন। তিনি শর‘ঈ দলিলের ওপর নির্ভর করেছেন, হক ছিলো তার পথের অগ্রদূত, আমানতদারিতা, সততা ও ইখলাস ছিলো তার শ্লোগান।

লেখক

ড. সালিহ ইবন গানিম আস-সাদলান

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9600

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন